জন্যও অর্থ ব্যয় হচ্ছে সরকারি তহবিল থেকে— যা জনগণেরই টাকা। (২) রাজ্য তথ্য কমিশন ২০০৬-এ মোট আটটি, ২০০৭-এ ৪৩ টি এবং ২০০৮-এ ১১২ টি আপিলের নিষ্পত্তি করেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন ২০০৭-এই শুনানি করে ৬৯৫৪ টি দ্বিতীয় আপিলের রায় দিয়েছে, যার মাসিক গড় ৫৭৯.৫। ২০০৮-এর ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনার শৈলেশ গান্ধী একাই ৪৫০ টি আপিলের নিষ্পত্তি করেছেন।

আমরা জানি, বিচারে দেরি হওয়ার অর্থ বিচার থেকে বঞ্চিত হওয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্যি, আইনটি লাগু হওয়ার পর থেকে ২০০৯-এর মার্চ মাস অবধি ৫৩০ টি দ্বিতীয় আপিল জমা পড়লেও, রাজ্য তথ্য কমিশন মাত্র ১৬৩ টির নিষ্পত্তি করেছে। রাজ্য তথ্য কমিশনের ভূমিকা দেখে তাই আশঙ্কা, এত ভাল একটা আইন কমিশনের গড়িমসিতে হয়তো ভোঁতা হয়ে যাবে। কারণ এর ফলে সরকারি কর্মী বা আধিকারিকেরা আরও উৎসাহিত হবেন তথ্য না দেওয়ার জন্য। (৩) তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫-এর বিভিন্ন ধারা মোতাবেক ৩০-৪৫ দিনের মধ্যে প্রথম আপিলের নিষ্পত্তি হওয়ার কথা। তা না হলে দ্বিতীয় আপিল বা কমিশনের কাছে আপিল করতে হয়। যার নিষ্পত্তির সময়সীমা সম্পর্কে আইনে কোনও কথা বলা নেই। অর্থাৎ তথ্য কমিশন চাইলে অনন্তকাল কোনও আপিলের শুনানি ঝুলিয়ে রাখতে পারে। যুক্তির দিক থেকে আইনে প্রথম ও দ্বিতীয় আপিলের মধ্যে সময়সীমার কোনও ফারাক থাকার কথা নয়। যদি ফারাক কিছু থাকে তা তবে আইনেই বলা থাকবে। আমরা যদি যুক্তির কথা ধরে নিই, তবে ৩০-৪৫ দিনের মধ্যেই দ্বিতীয় আপিলের নিষ্পত্তি করা উচিত কমিশনের। কিন্তু এখনও অবধি কোনও আপিলের নিষ্পত্তিই ওই সময়সীমার মধ্যে করেনি রাজ্য তথ্য কমিশন। ২২ নভেম্বর ২০০৮-এ তথ্যের অধিকার বিষয়ক এক রাজ্য কর্মশালায় রাজ্য তথ্য কমিশনের সচিব নন্দন রায় বলেছেন, তাঁদের একটা শুনানি করতে সময় লাগছে গড়ে ১০৫ দিন। এই হিসেবের মধ্যে যেসব মামলার শুনানি হয়েছে সেগুলিরই গড় হিসেব করা হয়েছে। অর্থাৎ যেসব দ্বিতীয় আপিলের শুনানি হয়নি, সেগুলি গড়ে কতদিন ধরে পড়ে আছে তা হিসেব করা হয়নি। এক্ষেত্রে আমাদের মনে হয়েছে, মামলাগুলি যত দেরি করে সমাধান করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে, তত এই আইনের প্রতি মানুষের অনাস্থা প্রকাশ পাবে। ফলে এভাবেই, একটা যুগান্তকারী আইন হওয়া সত্ত্বেও এই আইনের সুফল থেকে নাগরিক বঞ্চিত হবে। (৪) রাজ্য তথ্য কমিশনের আগে একটা ওয়েবসাইট ছিল, যেখানে অনেক ভুল তথ্য ছিল। বর্তমানে সেটি বাতিল করে নতুন ওয়েবসাইট হয়েছে। সেখানে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য নেই, যেমন, কত আপিল ও অভিযোগ জমা পড়েছে, সেগুলির বর্তমান অবস্থা কী, কমিশনের বাজেট বরাদ্দ কত, কী কী রিপোর্ট কমিশন প্রকাশ করেছে, দফতরগুলিতে কী কী নোটিশ, সার্কুলার পাঠানো হয়েছে ইত্যাদি। (৫) তথ্য কমিশনে কত দ্বিতীয় আপিল জমা পড়েছে, কত অভিযোগ জমা পড়েছে, কমিশন কতজনকে শোকজ করেছে এরকম আরও কয়েকটি বিষয় জানতে চেয়ে দু'টি ভিন্ন সময়ে আবেদন করা হয়েছিল। দু'টি ক্ষেত্রেই কমিশন যথা সময়ে উত্তর দিয়েছে। কিন্তু ওই দু'টি উত্তর পাশাপাশি রেখে দেখা গিয়েছে তাতে তথ্যের বিস্তর ফারাক। অর্থাৎ যারা তথ্যের অধিকার এরাজ্যে প্রয়োগের দায়িত্বে রয়েছেন তাদের তথ্যেই রয়েছে নানা রকম অসংগতি। বোঝা যাচ্ছে তাদের কাছেও তথ্যের অধিকার বিষয়টি গুরুত্বহীন।

নোডাল এজেন্সি: (১) এরাজ্যে তথ্যের অধিকার আইন প্রয়োগের কাজে নোডাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে, পার্সোনাল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিপার্টমেন্ট-এর অধীন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এটিআই)। বর্তমানে তাদের ওয়েবসাইট থেকে জানা যাচ্ছে, তারা ১৭ দফা কাজ করেছে, যার মধ্যে সচেতনতা কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ, প্রচার ইত্যাদি রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, যারা তথ্য দেবে তাদের জন্য গত তিন বছরে এটিআই ২৪ টি প্রশিক্ষণ সংগঠিত করেছে। এই সংখ্যা খুবই কম। কারণ শুধু গ্রাম পঞ্চায়েতেই তথ্যের অধিকার আইনে সরাসরি যুক্ত আছে ৬৭০৮ জন কর্মী। এছাড়া রয়েছেন অন্যান্য আরও বিভাগের কর্মীরাও। (২) নোডাল এজেন্সির বক্তব্য অনুযায়ী, মালদা ও পশ্চিম মেদিনীপুর পাইলট জেলা। এই দু'টি জেলার কোনও অফিসেই এই আইনের ধারা ৪-১-বি অনুযায়ী কোনও তথ্যের স্বতঃস্ফূর্ত ঘোষণা করা হয়নি। সম্প্রতি ১৪.০৫.২০০৯ তারিখে তথ্যের অধিকার আইন মোতাবেক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, মালদার ওল্ড মালদা, কালিয়াচক-৩ এবং হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতি (যাদের অফিস নির্দিষ্ট ব্লকের অফিসে) ওই আবেদন ফেরত পাঠিয়ে জানিয়েছেন, পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার বা পিআইও নামে ওই ব্লকে কেউ আছে কিনা তা তারা জানে না। (৩) মানুষের সব থেকে কাছে রয়েছে পঞ্চায়েত। এ রাজ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে ৩৩৫৪